গবেষণায় ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন

ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ

ডাঃ মোঃ আবু ইউসুফ

ডাঃ মোঃ জাকির হাসান

ডাঃ মোঃ জুলফিকার আলী

ড. মোঃ শওকত মাহমুদ

ডাঃ ইউশা ইসলাম

ডাঃ মোঃ আশরাফুল ইসলাম

বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প

প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

টেলিফোন: ০২-৭৭৯১৬৯০, ফ্যাক্স: ০২-৭৭৯১৬৭৫

ই-মেইল: mgias04@yahoo.com, ওয়েবসাইট: www.blri.gov.bd

বিএলআরআই প্রকাশনা নম্বর : ৩১৫

পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল

(OIE নির্দেশনা মোতাবেক)

BLRI PPR CONTROL MODEL According to OIE

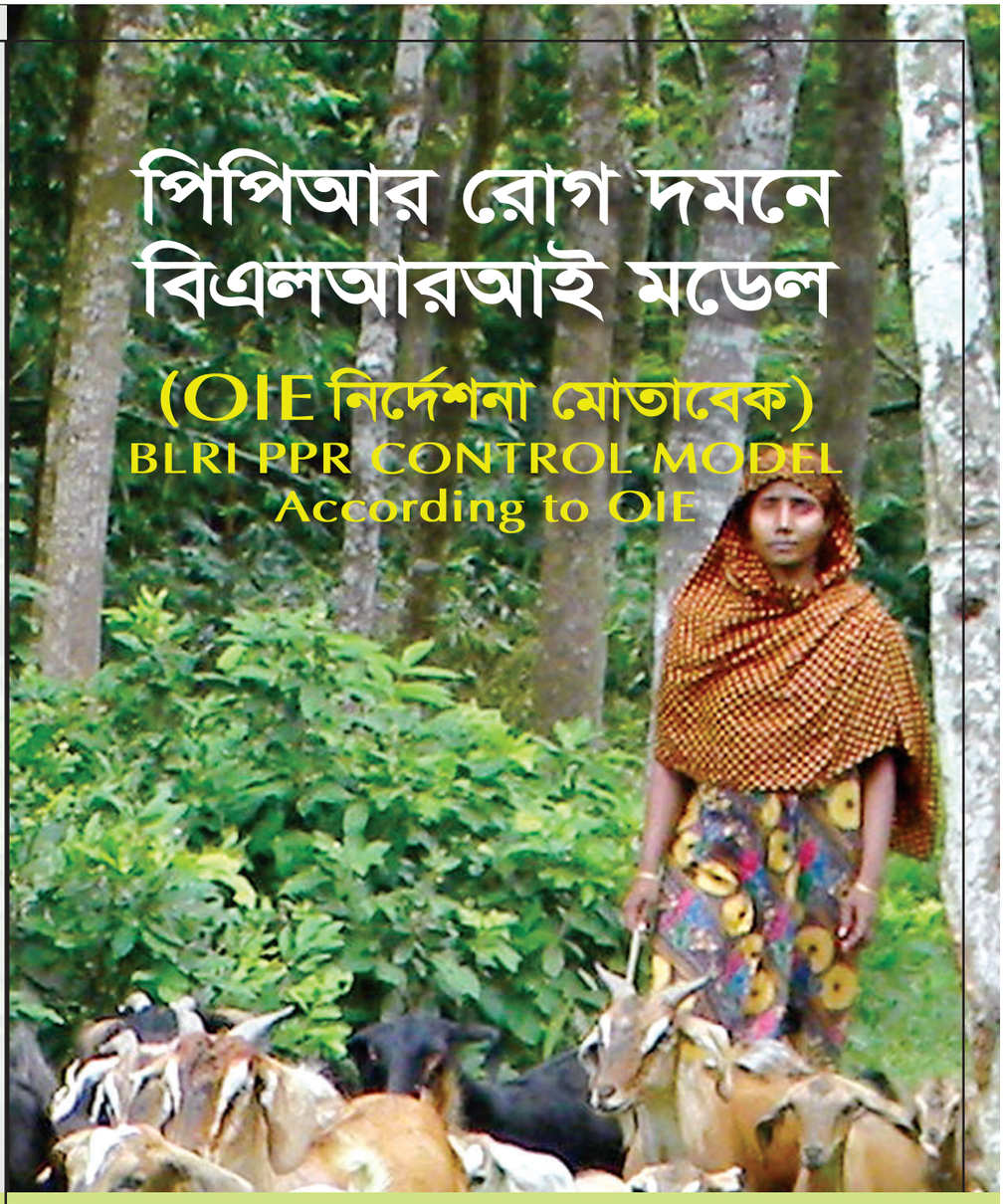

বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্প

প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা।

পিপিআর রোগ দমনে বিএলআরআই মডেল
(OIE নির্দেশনা মোতাবেক)

ভূমিকা

পিপিআর (Peste des Petitis Ruminants) ছাগল ও ভেড়ার একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ছাগল ও ভেড়ার শতকরা ৮০ ভাগেরই মৃত্যু হতে পারে। আফ্রিকার আইভোরি কোষ্টে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম এ রোগ সনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলায় রোগটি মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং এর পর হতে প্রায় প্রতি বৎসর এ রোগের কারণে দেশে ছাগল ও ভেড়ার ব্যাপক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। রোগটি বর্তমানে বাংলাদেশসহ সার্কভূক্ত অঞ্চলে নিয়মিত মহামারী (Endemic disease) হিসাবে চিহ্নিত। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৪ সাল হতে এ রোগের উপর বিভিন্ন গবেষণা করে আসছে। এ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ ১৯৯৯ সালে এ অঞ্চলে প্রথম পিপিআর হোমোলোগাস ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করে যা ২০০০ সালে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাখালীস্থ ভ্যাক্সিন উৎপাদন গবেষণাগারে ভ্যাক্সিনটি উৎপাদন করে সারা দেশের খামারীদের মাঝে বিতরণ করে আসছে। ভ্যাক্সিন ব্যবহারের উপর সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা এবং এ রোগ নিয়ন্ত্রণে কোন পরিকল্পনা বা মডেল নিয়ে তেমন গবেষণা না থাকায় অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্নভাবে পিপিআর রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হচ্ছিল। ফলে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এমনকি বাণিজ্যিক খামারেও প্রায়ই এ রোগের প্রাদুর্ভাবের তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল। আন্তর্জাতিক প্রাণিরোগ সংস্থা (OIE) ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে পিপিআর মুক্ত করার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর দমনের মডেল উদ্ভাবনের জন্য 'বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক সার্ক রিজিওনাল পিপিআর গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং পিপিআর রোগের উপর বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তাপ সহিষ্ণু পিপিআর ভ্যাক্সিন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে পিপিআর রোগ দমনের কার্যকরী কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে দেশের সর্বাধিক ছাগল সমৃদ্ধ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার ২২টি গ্রামে এবং

মানিকগঞ্জ জেলার ২টি গ্রামে গবেষণা পরিচালিত হয়। গত পাঁচ বৎসরের নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে পিপিআর রোগ দমনের কার্যকরী মডেল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে এবং পিপিআর রোগে ছাগলের মৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় নামানো সম্ভব হয়েছে। ফলে গবেষণা এলাকায় উল্লেখযোগ্য হারে ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি ছাগল বা ভেড়াকে পিপিআর রোগের ভ্যাক্সিন ঠিকমত দেয়া হলে এবং মডেলে উদ্ভাবিত কৌশল অবলম্বন করা হলে উক্ত ছাগলে বা ভেড়ায় সারাজীবন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। আশা করা যায় এ মডেলের মাধ্যমে বাংলাদেশের ছাগল ও ভেড়ার মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হবে।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত পিপিআর রোগ দমনের মডেল বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো সন্নিবেশ করা প্রয়োজন :

১। মানসম্পন্ন গবেষণাগারঃ

পিপিআর দমনের জন্য দ্রুত পিপিআর রোগ সনাক্তকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আক্রান্ত প্রাণী দ্রুত পৃথক করে রোগ বিস্তারের বাধা দেয়া যায়। এ ছাড়াও এন্টিবডির উপস্থিতি নির্ণয়, সংগ্রহকৃত নমুনা সংরক্ষণ, যথাযথভাবে নমুনা পরিবহন, ভ্যাক্সিন সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য মানসম্পন্ন গবেষণাগার আবশ্যক। সুতরাং মডেল বাস্তবায়িত হবে এমন এলাকার নিকটস্থ সরকারী বা বেসরকারী যে কোন প্রাণিরোগ অনুসন্ধান গবেষণাগারের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে বিএলআরআই এ স্থাপিত সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরী ফর পিপিআর (SAARC-RLDL for PPR) গবেষণাগারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

২। দক্ষ জনবল :

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষ জনবলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, যথাযথভাবে ভ্যাক্সিন প্রদান, নমুনা সংগ্রহ, গবেষণাগারে রোগ সনাক্তকরণ, বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পাদন, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৩। খামারী প্রশিক্ষণ :

আমাদের দেশের অধিকাংশ খামারীর ছাগল পালন, রোগ দমন, পুষ্টির প্রাপ্যতা, জীবনিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণা নেই। তাই রোগটি দমন করতে হলে প্রথমেই খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। উক্ত প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

ক) পিপিআর রোগের লক্ষণ

পিপিআর রোগের লক্ষণসমূহ, রোগ প্রাদুর্ভাবের সম্ভাব্য সময়কাল এবং অন্যান্য রোগের সঙ্গে পিপিআর এর মিল এবং অমিল ইত্যাদি সম্বন্ধে খামারীদের ধারণা প্রদান করতে হবে।

পিপিআর এর প্রধান লক্ষণসমূহ

- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ হতে থাকে এবং সর্দি কাশি থাকে (নিউমোনিয়া)।
- শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় (১০৫°-১০৭° ফারেনহাইট) এবং পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া শুরু হয়। দাঁতের মাড়ি ও মুখে ঘা দেখা দেয়। চিকিৎসা না হলে ৪-৯ দিনের মধ্যে ছাগল মারা যায়।

আক্রান্ত অবস্থায় পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া

নাক ও মুখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ

খ) পিপিআর রোগ কীভাবে ছড়ায়

পিপিআর রোগটি অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির সংক্রামক রোগ। এ রোগের ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে প্রায় ৩-৪ মাইল দূরের সুস্থ ছাগল, ভেড়াকে আক্রান্ত করতে পারে। এছাড়া আক্রান্ত প্রাণীর লালা, খাবার ও খাবারের পাত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ প্রাণী রোগাক্রান্ত হয়।

গ) ছাগলের বাসস্থান

ছাগলের রোগ বালাই কম হলেও ছাগল একটি তাপ সংবেদনশীল প্রাণী। অল্পতেই ছাগলের ঠান্ডাজনিত অসুখ হতে পারে। তাই ছাগলের বাসস্থান কোথায় এবং কীরূপ হওয়া উচিৎ তা খামারীদের অবহিত করতে হবে। মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করলে ছাগল ও ভেড়ার রোগবালাই অনেকাংশে কমে যায়।

ঘ) খাদ্য সরবরাহ

ছাগলের খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রাপ্যতা, খাদ্যের পরিমাণ এবং পানি প্রদানের পরিমাপের বিষয়গুলি খামারীদের কাছে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। ছাগল ও ভেড়াকে মাঠে চারণের ব্যবস্থা করলে দৈহিক ওজন বৃদ্ধিসহ, বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ঙ) জীব নিরাপত্তা

গবাদি প্রাণী পালনের ক্ষেত্রে জীব নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খামারীদের মধ্যে জীব নিরাপত্তার ধারণাটি অস্পষ্ট। জীব নিরাপত্তার নিয়মকানুনগুলি মেনে কীভাবে ছাগল ও ভেড়ার খামার রোগবালাই থেকে দূরে রাখা যাবে সে সব উপায়গুলি এবং মৃত ছাগলের দেহাবশেষ সৎকারের নিয়মগুলি খামারীদের জানাতে হবে।

চ) সাধারণ বিষয়াবলী

১) **পৃথকীকরণ (Isolation):** যেহেতু পিপিআর একটি সংক্রামক রোগ, তাই এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলেই, ছাগল ভেড়াকে আলাদা বাসস্থানে রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাণী স্বাস্থ্যকর্মী অথবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে তথ্য প্রদান করতে হবে।

২) **প্রাণী কোয়ারেন্টাইন (Quaraintine):** বাজার থেকে বা অন্য কোন দেশ থেকে প্রাণী সংগ্রহ করা হলে ২১ দিন প্রাণী কোয়ারেন্টাইন করে মূল খামারে আনতে হবে।

৩) **কৃমিনাশক প্রদান:** নির্বাচিত এলাকায় ২ মাসের অধিক বয়সের সকল ছাগলকে একই সাথে বিভিন্ন ধরনের পরজীবীর উপর কার্যকর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। প্রথমবার কৃমিনাশক দেয়ার পর ১৪ দিন পর পুনরায় কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ৪ মাস পর পর সকল ছাগলকে কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। ফলশ্রুতিতে ছাগলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং প্রদানকৃত ভ্যাক্সিন হতে ভাল এন্টিবডি পাওয়া যাবে। কৃমিনাশক প্রদানের পর ভিটামিন মিনারেল সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

গণকৃমিনাশক প্রদান

৪) পিপিআর ভ্যাক্সিন পরিচিতি, ভ্যাক্সিন প্রদান ও পরিবহনের নিয়মাবলী

বাংলাদেশে ও পাশ্ববর্তী দেশসমূহে পিপিআর ভাইরাসের Lineage-IV সেরোটাইপটি পাওয়া যায়। এ ভাইরাসের ৪ টি Lineage (Lineage-I, II, III, IV) এর জেনেটিক সামঞ্জস্যতা অনেক বেশী হওয়ার PPR virus serotype-2 Lineage-I (Nigeria N-75) দিয়ে বিশ্বব্যাপী ২০৩০ সালের মধ্যে

পিপিআর ভ্যাক্সিন

পিপিআর নির্মূল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল প্রয়োগ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় ভ্যাক্সিন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরী যেমন, ভ্যাক্সিন এর কার্যকারিতা ও ভ্যাক্সিন প্রদানের নিয়মাবলী সম্বন্ধে খামারীদের অবহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

ক) ১০০ সিসি বোতলে পিবিএস দিয়ে ভ্যাক্সিন ট্যাবলেট গোলাতে হবে। সকালে কম তাপমাত্রার সময় এ ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা ভাল।

খ) ভ্যাক্সিন গোলানোর পর ২ ঘন্টার মধ্যে ১০০ টি ছাগলে ভ্যাক্সিন প্রদান করে শেষ করতে হবে। এজন্য ছাগলগুলি ভাগ করে ২/৩ জন ভ্যাক্সিন প্রদানকারী এক সাথে ভ্যাক্সিন প্রদান শুরু করতে পারে। এর ফলে ২ ঘন্টার মধ্যে দ্রুত সকল গোলানো ভ্যাক্সিন ব্যবহার হয়ে যাবে। পরবর্তীতে কেবল মাত্র ২ মাস বয়সোর্ধ্ব নতুন বাচ্চা ছাগলকে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে।

গ) পিপিআর ভ্যাক্সিন চামড়ার নিচে দিতে হয়। তবে প্রিস্ক্যাপুলার লিম্ফনোড এর কাছে (সামনের পায়ের যে অংশ শরীরের সাথে লাগানো থাকে) চামড়ার নিচে ভ্যাক্সিন দিলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এজন্য ভ্যাক্সিন প্রদানকারী প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী ২-৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে অথবা একসাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে পারে।

ঘ) ২ মাস বয়সের উপর সকল ছাগলকে একসঙ্গে একই দিনে ১ মিলি পরিমাণ গোলানো ভ্যাক্সিন প্রিস্ক্যাপুলা লিম্ফনোড এর উপরের চামড়ার নিচে প্রদান করতে হবে।

ঙ) ভ্যাক্সিন সকল সময় ফ্রিজে নিম্ন তাপমাত্রায় ২-৮° সে. তাপমাত্রায় ১ মাস সংরক্ষণ করা যায়। এর জন্য গবেষণাগারে বা সংরক্ষণগারে ফ্রিজ থাকা এবং বিরতিহীন বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

চ) ভ্যাক্সিন পরিবহন ও সরবরাহের সময়ও সঠিক কুল চেইন (ঠান্ডা অবস্থা) এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ) ভ্যাক্সিন প্রদান পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা: ভ্যাক্সিন প্রদানকৃত ছাগলে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাই করার জন্য ১ মাস, ৬ মাস ও ১ বৎসর পরে

রক্ত সংগ্রহ করে এন্টিবডি লেভেল (রোগ প্রতিরোধ মাত্রা) পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সাধারণত সঠিকভাবে ১ বার পিপিআর ভ্যাক্সিন প্রদান করা হলে উক্ত প্রাণীকে আর পিপিআর ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হয় না (ছাগল ভেড়ার গড় আয়ু ৫ বছর)।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত পিপিআর দমন মডেল

আন্তর্জাতিক প্রাণিরোগ সংস্থা (OIE) বিশ্ব থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে পিপিআর নির্মূল করার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে বাংলাদেশে ক্ষুরারোগ ও পিপিআর গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও দমনে বিএলআরআই মডেল উদ্ভাবন করেছে। এ মডেলের মাধ্যমে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় ২০১৬ সাল থেকে প্রায় ১ লক্ষ ছাগলের পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

মডেল বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথমত এ মডেলের জন্য এলাকা নির্বাচন এবং গবেষণাগার নির্বাচন করতে হবে। পরবর্তীতে পিপিআর নির্মূলের জন্য OIE নির্দেশিত চার (৪) টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে। এ ধাপগুলির কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হল-

এলাকা নির্বাচন - একটি এলাকা (গ্রাম, ইউনিয়ন বা উপজেলা) পিপিআর মুক্ত করার জন্য নির্বাচন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকাটি নির্ধারণে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের (Natural Barrier) উপস্থিতি বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন- কোন নদী বা খালকে এলাকার সীমানা হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রাথমিক ধাপ, সেখানে একটি নতুন অঞ্চলে পিপিআর এর প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। নির্বাচিত এলাকার ছাগলের পরিসংখ্যান বের করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে জরিপ (Baseline survey) সম্পন্ন করতে হবে। পরিসংখ্যানে ভ্যাক্সিন প্রদানের তথ্য, বয়স, আনুমানিক শুমারী (প্রতি বছর ছাগলের জন্ম, মৃত্যু, ক্রয়, বিক্রয়, জবাই ইত্যাদির কারণে ছাগলের স্থিতির পরিমাণ), রোগ প্রবণতা বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

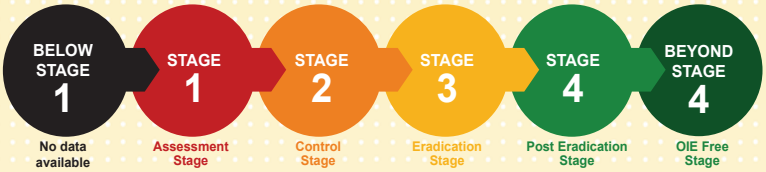

OIE নির্দেশিত পিপিআর দমনের চারটি ধাপ

OIE নির্দেশিত চারটি ধাপ ও এর কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হলো

ধাপ-০: তথ্য বিহীন পর্যায় (No Data Stage)

পিপিআর রোগ সম্বন্ধে যখন কোন দেশে বা অঞ্চলে কোন তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছেনা বা এ বিষয়ে খুব সামান্য তথ্য আছে এবং পিপিআর রোগ দমনের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি, এমন পর্যায়টিকে ধাপ শূন্য বলা হয়। পিপিআর রোগের কোন টিকা প্রদান করা হয় কিনা এ ধরনের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

ধাপ-১: মূল্যায়ন ধাপ (Assesment Stage)

ইপিডিমিওলজিক্যাল জরিপের মাধ্যমে, নির্বাচিত অঞ্চলের পিপিআর রোগের ঝুঁকি সনাক্ত ও প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে। জরিপের সময় বছরের কোন সময় এ অঞ্চলে পিপিআর রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, কী সংখ্যায় ছাগল, ভেড়া সংক্রামিত হয় ও কী সংখ্যায় প্রাণী মারা যায় তার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। খামারী পিপিআর ভ্যাক্সিন দেয় কিনা, চিকিৎসা সেবা পর্যাপ্ত কিনা, রোগ সনাক্তকরণের জন্য কোন গবেষণাগার আছে কিনা তা বিবেচনায় আনতে হবে।

এই ধাপটিতে নিম্নলিখিত আরও কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে-

ক) একটি বেজ লাইন জরিপ করে মোট ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

খ) পিপিআর সম্পর্কে খামারী ও এলাকাবাসীর ধারণা কী, তা বিবেচনায় আনতে হবে।

গ) পিপিআর নিয়ন্ত্রণে সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে হবে

ঘ) কৃমি মুক্তকরণ ও ভ্যাক্সিন প্রদান সমন্ধে খামারীর ধারণা জানতে হবে

ঙ) ছাগল ও ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খামারীর ধারণা জানতে হবে

চ) মানসম্মত পরীক্ষাগার নির্বাচন (রোগ সনাক্তকরণের জন্য) করতে হবে

ছ) দক্ষ জনবল নির্বাচন করতে হবে (পিপিআর বিশেষজ্ঞ, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ল্যাবরেটরি পার্সনেল)

জ) সিরোসার্ভিলেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর ভাইরাসের ভ্যাক্সিন পূর্ববর্তী প্রতিরোধ ক্ষমতা যাচাইকরণের জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে এলাইজা পদ্ধতিতে এন্টিবডি লেভেল দেখতে হবে।

ঝ) পিপিআর সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে

ঞ) প্রকল্প এলাকা থেকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী তৈরী করতে হবে।

ট) খামারীদের মাচা পদ্ধতিতে ছাগল ও ভেড়া পালনে পরার্মশ দিতে হবে।

ধাপ- ২: পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ধাপ (Planning and Control Stage)

ক) সমাজভিত্তিক রোগ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি :

পিপিআর রোগ দমনের জন্য প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, প্রাণিস্বাস্থ্য কর্মী, এবং সহযোগী সংস্থা নিয়ে একটি সমন্বিত মনিটরিং ও কার্যকরী টিম গঠন করতে হবে। এ কমিটি পিপিআর দমনে গণকৃমিনাশক ও গণ ভ্যাক্সিন প্রদান (Mass Vaccination) কর্মসূচি সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করবে। গণভ্যাক্সিন প্রদান কর্মসূচি শুরু করার পূর্বে উক্ত প্রকল্প এলাকায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ (মাইকিং পোষ্টার, উঠান বৈঠক) করে ভ্যাক্সিন প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

খ) বাফার জোন তৈরী :

যে এলাকাটি পিপিআর মুক্ত মডেলের আওতায় থাকবে তার চারদিকে অন্ততপক্ষে এক কিলোমিটার এলাকার সকল ছাগল ও ভেড়াকে কৃমিনাশক ও পিপিআর ভ্যাক্সিনেশন এর আওতায় আনতে হবে। ধাপ-২ শুরুর অন্তত পক্ষে ১ মাস আগে বাফার জোন তৈরী করতে হবে। বাফার জোনে পিপিআর রোগের এন্টিবডি নিশ্চিত করতে হবে।

গ) গণ কৃমিনাশক প্রদান :

নির্বাচিত এলাকায় ২ মাসের অধিক বয়সের সকল ছাগল ও ভেড়াকে একই সাথে বিভিন্ন ধরনের পরজীবীর উপর বিস্তৃতভাবে কার্যকর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

ঘ) পিপিআর গণ ভ্যাক্সিন প্রদান (Mass Vaccination) ও ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা যাচাই :

দুই মাস বয়সের উর্ধ্বে সকল ছাগল ও ভেড়াকে চামড়ার নিচে ১ সিসি. একবার ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। কেননা, এই ভ্যাক্সিনটি অবনমিত (Attenuated) জীবন্ত পিপিআর ভাইরাস হওয়ায় একবার দিলে আর দিতে হয় না। তবে, পিপিআর দমন কৌশলে হার্ড ইমিউনিটির জন্য ছাগল ও ভেড়াকে ১ম ডোজ দেয়ার ৬ মাস পর অধিক কার্যকারিতার জন্য (Boosting) ২য় ডোজ দিতে হবে। এলাকায় নতুন ক্রয় করা ছাগল, ভেড়াকে একই নিয়মে ভ্যাক্সিন প্রদান করতে হবে। ভ্যাক্সিন সব সময় ৪° ডিগ্রী সেঃ তাপ মাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এ ধাপের কার্যক্রমটি টানা ৩ বছর চলমান রাখতে হবে।

গণভ্যাক্সিন প্রদান কর্মসূচি

ঙ) পিপিআর ভ্যাক্সিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ও ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা যাচাই :

প্রাণীর সর্বমোট সংখ্যার উপর গড় ভিত্তিক একটি সিরোলজিক্যাল জরিপ করা প্রয়োজন যা, পিপিআর ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডির পরিমাণ তথা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করবে। ভ্যাক্সিন প্রদানের পূর্বে ও ২১ দিন পর ছাগল ভেড়া থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে রক্ত নমুনা সংগ্রহ করে এন্টিবডির পরিমাণ যাচাই করতে হবে। উক্ত এলাকায় পিপিআর রোগের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা (হার্ড ইমিউনিটি) নিশ্চিত করতে হবে। পর পর তিন বছর ইমিউনিটি পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচিত এলাকায় যখন পর্যাপ্ত হার্ড ইমিউনিটি পাওয়া যাবে, তখন পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে।

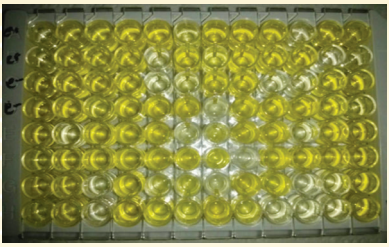

এন্টিবডি পর্যবেক্ষণের জন্য রক্ত সংগ্রহ ও পরীক্ষণ

চ) পিপিআর রোগের সংক্রমণ এবং ছাগল, ভেড়ার একই ধরনের অন্যান্য রোগ সনাক্তকরণ :

পিপিআর বা পিপিআর সদৃশ কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত কারণ উদঘাটন করার জন্য মলিকুলার পদ্ধতি ব্যবহার করে (পিসিআর) রোগটি সনাক্ত করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাইরাসের সকল জেনেটিক বৈশিষ্ট্য পাওয়ার পর তা পিপিআর রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

ছ) সাধারণ বিষয়াবলী ঃ রোগ দেখা দিলে খামারী তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনা, জরিপকারীদের ও নমুনা সংগ্রহকারীদের নিবিড় সহায়তা প্রদান, খামারীদের স্বাস্থ্য তথ্য সংরক্ষণ (স্বাস্থ্য কার্ড) প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যায়ে যথাযথ ভ্যাক্সিন প্রদান করার পরে এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়েও খামারীকে সচেতন করতে হবে।

১) সংক্রমিত এলাকা থেকে ছাগল ভেড়া মডেল এলাকায় আনা যাবে না।

২) যদি কোন প্রাণীতে পিপিআর রোগের লক্ষণ দেখা যায় তবে তা দ্রুত আলাদা করে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়াও যে কোন রোগ দেখা দিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

৩) প্রকল্প এলাকায় ছাগলের খামার করতে গেলে হাট বা বাজার থেকে ছাগল কেনা যাবে না। এ ক্ষেত্রে পিপিআর এর ভ্যাক্সিন দেওয়া আছে এমন তথ্য নিশ্চিত হয়ে ছাগল বা ভেড়া ক্রয় করতে হবে।

পিপিআর মুক্ত অঞ্চলের সাইনবোর্ড

এনিম্যাল হেলথ কার্ড

৪) গণ ভ্যাক্সিনেশনের পর প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৫) ছাগল, ভেড়ার খামার উঁচু জায়গা কিংবা মাচা পদ্ধতিতে করলে ছাগলের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, রোগবালাই কম হয় এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়। প্রাণীর বিভিন্ন বর্জ্য যেমন, উচ্ছিষ্ট খাদ্য, গোবর, মূত্র ইত্যাদি জীব নিরাপত্তা ক্ষেত্রে হুমকি এবং বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে। এসব বর্জ্য একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট করে পুনঃ ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারে।

ধাপ-৩: নির্মূল ধাপ (Eradication Stage)

ধাপ ২ (দুই) এর ৩য় বছর পর ধাপ-৩ এ নিশ্চিত করতে হবে যে চতুর্থ বছরে পিপিআর ভ্যাক্সিন দেয়ার পর নির্বাচিত এলাকায় কোন একটি ছাগল, ভেড়া পিপিআর রোগে মারা যায় নাই। পরীক্ষার রিপোর্ট এর ভিত্তিতে প্রায় শতভাগ (১০০%) পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা (হার্ড ইমিউনিটি) আছে তা নিশ্চিত হতে হবে। মডেল এলাকায় যাতে পুনরায় রোগ সংক্রমণ হতে না পারে তা নিশ্চিত হতে হবে। এক্ষেত্রে, কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি, যা থাকলে মডেল এলাকায় পুনরায় রোগ সংক্রমণের কারণ হতে পারে তা মনিটরিং কমিটির সহায়তায় সমাধান করতে হবে।

এ পর্যায়টি একটি নির্দিষ্ট সময় (১ থেকে ৩ বছর) পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে হবে। এ অঞ্চলের ছাগল, ভেড়াতে শতভাগ (১০০%) পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতার (হার্ড ইমিউনিটি) বিষয়ে নিশ্চিত হবে। উক্ত এলাকার আশেপাশে পিপিআর রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলেও প্রকল্প এলাকায় পিপিআর রোগের কোন সংক্রমণ থাকবে না। এ ধাপে আঞ্চলিকভাবে উক্ত অঞ্চলকে ভ্যাক্সিন প্রদানসহ পিপিআর মুক্ত অঞ্চল (Regional PPR free Zone with vaccination) ঘোষণা করা যেতে পারে। উক্ত অঞ্চলকে পিপিআর মুক্ত অঞ্চল (PPR free zone) ঘোষণার করার জন্য OIE তে আবেদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

ধাপ-৪: নির্মূল পরবর্তী ধাপ (Post Eradication Stage)

তৃতীয় ধাপ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার পর ধাপ-৪ এ ব্যাপক নজরদারির মাধ্যমে পরবর্তী এক বছর আঞ্চলিক পিপিআর মুক্ত এলাকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। মূলত বিএলআরআই পিপিআর রোগ দমনে মডেলটি একটি পাঁচ বছর মেয়াদী প্যাকেজ প্রযুক্তি। এ ধাপে এলাকাটি আঞ্চলিকভাবে **'ভ্যাক্সিন প্রদান ছাড়া পিপিআর মুক্ত এলাকা** (Regional PPR free Zone with vaccination)' ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত হবে। এ ধাপটির স্বীকৃতির জন্য OIE এর কাছে নিয়ম নীতি মেনে আবেদন করা হলে OIE পর্যবেক্ষণ দল নিরীক্ষার পর সনদ দিলেই কেবল এলাকাটিকে চূড়ান্তভাবে ভ্যাক্সিন ছাড়া 'পিপিআর মুক্ত অঞ্চল' ঘোষণা দেয়া যেতে পারে।

ধাপ- OIE পিপিআর মুক্ত এলাকা (OIE PPR free status)

এই ধাপটিকে ধাপ-৪ এর পরবর্তী ধাপ বুঝায় অর্থাৎ OIE পিপিআর মুক্ত এলাকা ঘোষণা করার পরের ধাপ। এই ধাপে এলাকাটি OIE পিপিআর মুক্ত এলাকা হিসেবে স্বীকৃত থাকবে। বিশ্বের মানচিত্রে উক্ত এলাকাটি ছাগল, ভেড়ার পিপিআর মুক্ত এলাকা (Green Zone) হিসেবে নির্দেশিত থাকবে। উক্ত এলাকার কোন ছাগল বা ভেড়া পিপিআর রোগে মারা যাবে না ।

উপসংহার:

বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পিপিআর নিয়ন্ত্রণ মডেল ও আন্তর্জাতিক প্রাণিরোগ সংস্থা (OIE) কর্তৃক পিপিআর নির্মূল পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপ (নির্মূল ধাপ)

পর্যন্ত করণীয় বিষয়গুলি অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছাগলের মৃত্যুর হার শূন্যের কোঠায় নামানো সম্ভব হয়েছে এবং উক্ত এলাকাগুলি বর্তমানে OIE এর নির্দেশনা মোতাবেক চতুর্থ ধাপে অবস্থান করছে। প্রযুক্তিটি সারা দেশে বা কোন অঞ্চলে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করে উক্ত অঞ্চলকে OIE এর নির্দেশনা মোতাবেক "পিপিআর মুক্ত অঞ্চল" ঘোষণা করা যেতে পারে।

পিপিআর রোগের চিকিৎসা

উপরে নির্দেশিত বিষয়গুলি অনুসরণের পরও যদি কোন প্রাণীতে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে দ্রুত ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পিপিআর রোগে এন্টিবায়োটিক সহযোগে হাইপার ইম্মিউন সিরাম প্রদান একটি কার্যকরী চিকিৎসা।

পিপিআর চিকিৎসার ক্ষেত্রে করণীয়

১. দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এন্টিবায়োটিক প্রদান করতে হবে।

২. এন্টিবায়োটিক এর সঙ্গে হাইপার ইম্মিউন সিরাম প্রয়োগ করা হলে শতকরা ৮০ ভাগ ছাগল আরোগ্য লাভ করে।

ছাগলের পিপিআর চিকিৎসায় ইম্মিউন সিরাম (এ্যান্টিসিরাম) ব্যবহার ঃ

ইম্মিউন সিরামের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা বহু পুরাতন। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট অনেকদিন ধরে ইম্মিউন সিরাম দ্বারা ছাগল, ভেড়ার পিপিআর রোগের চিকিৎসায় গবেষণা করে আসছে। এ গবেষণায় দেখা যায় ইম্মিউন সিরাম দ্বারা ছাগলের পিপিআর চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকরী।

ইম্মিউন সিরাম ঃ পিপিআর আক্রান্ত ছাগল সুস্থ্য হলে প্রাকৃতিকভাবে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয় তা ছাগলের রক্তরসে সারা জীবন সংরক্ষিত থাকে যাকে ইম্মিউন সিরাম বলা হয়।

হাইপার ইম্মিউন সিরাম ঃ প্রাণীতে কয়েকবার ভ্যাক্সিন প্রদান করলে যে অধিক কার্যকরী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী হয় তাকে হাইপার ইম্মিউন সিরাম বলে।

হাইপার ইম্মিউন সিরাম প্রস্তুত, সংগ্রহ ও প্রয়োগ ঃ

আমাদের দেশে পিপিআর হাইপার ইম্মিউন সিরাম সহজ লভ্য নয়। প্রথম পদ্ধতিটি হ'ল, কোন ছাগল পিপিআর আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ্য হলে ঐ ছাগল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সেখান থেকে সিরাম আলাদা করে তা রোগাক্রান্ত ছাগলে ৩-৫ মিলি/২০ কেজি দৈহিক ওজনে শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। একবার প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে ২-৩ দিন পর আরও একবার একই মাত্রায় ইম্মিউন সিরাম প্রয়োগ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত পদ্ধতিটি হ'ল, খামারের কয়েকটি সুস্থ ছাগলে ১ মাস অন্তর অন্তর ২ থেকে ৩ বার পিপিআর ভ্যাক্সিন দেয়া হলে উক্ত ছাগলে উচ্চ মাত্রায় পিপিআর এর এন্টিবডি প্রস্তুত হবে। এ সকল ছাগল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে তা থেকে সিরাম আলাদা করে পিপিআর আক্রান্ত ছাগলের শিরায় প্রয়োগ করতে হবে। ২০ কেজি ওজনের একটি ছাগল হতে ৩০-৪০ মিলি লিটার রক্ত সংগ্রহ করা যায়। এই রক্ত ২-৩ ঘন্টা ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে প্রায় ১৫-২৫ মিলি লিটার সিরাম পাওয়া যাবে যা ৩-৪টি রোগাক্রান্ত ছাগলের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা য়ায়। ভ্যাটেরিনারিয়ান কিংবা খামারীগণ চিকিৎসার জন্য নিজেরা তার এলাকা বা খামারে সহজেই কিছু ছাগলকে পিপিআর রোগের এ্যান্টিসিরাম ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। প্রয়োজনে যা থেকে সিরাম সংগ্রহ করে চিকিৎসায় ব্যবহার করা সম্ভব। এ সিরাম সংগ্রহের জন্য খাসী ব্যবহার উপযুক্ত, কারণ প্রয়োজনে খাসী জবাই করে অনেক রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব। চিকিৎসায় ভাল ফল পেতে হলে মানসম্মত সিরামের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তবে, কোন অবস্থাতেই অস্বচ্ছ বা ঘোলাটে সিরাম ব্যবহার করা যাবে না। শিরায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অল্প উষ্ণ (৩০°-৩৭° সেলসিয়াস) সিরাম প্রয়োগ করতে হবে।

সিরাম পৃথকীকরণ ঃ সাধারণত সিরিঞ্জে রক্ত সংগ্রহ করার পর একটু কাত করে ২-৩ ঘন্টা ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে সিরিঞ্জের সামনের দিকে হালকা গোলাপী থেকে হালকা হলুদাভ রংয়ের সিরাম উঠে আসবে এবং নিচের দিকে জমাট বাঁধা রক্ত দেখা যাবে। সাবধানে সিরিঞ্জ কাত করে সিরাম এপেনডর্প টিউব বা যেকোন জীবাণুমুক্ত টিউবে সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়াও রক্ত সংগ্রহ করার পর ল্যাবরেটরীতে ৩০০০-৪০০০ আরপিএম এ ৫ মিনিট সেন্ট্রিফিউজ করে সিরাম পৃথক করা যায়।

এ্যান্টিসিরাম-এ্যান্টিবায়োটিক সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি (Antibiotic Combind Hyperimmune Serum Treatment) :

এটি একটি সমন্বিত চিকিৎসা পদ্ধতি যা পিপিআর এ্যান্টিসিরাম (Antiserum) এর সঙ্গে এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে পিপিআর রোগাক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা করা হয়।

এই চিকিৎসার উদ্দেশ্য হ'ল, একই সঙ্গে পিপিআর রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসকে ধ্বংস করা এবং ভাইরাসজনিত আক্রমণের ফলে শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙ্গে পড়ার কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ (Secondary infection) কে মোকাবেলা করা।

৪. পিপিআর আক্রান্ত প্রাণীর ডায়রিয়াজনিত পানি শূন্যতা পূরণের জন্য মুখে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

৫. ছাগল পিপিআর রোগে মারা গেলে অবশ্যই দূরে কোথাও গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে

পিপিআর নিয়ন্ত্রণে অবশ্য করণীয় :

১. সংক্রমিত এলাকা বা বাজার থেকে কোন ছাগল বা ভেড়া এ এলাকায় আনা যাবে না।

২. যদি কোন প্রাণীতে এ রোগের লক্ষণ দেখা যায় তবে তা দ্রুত আলাদা করে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. এ এলাকায় অবাধ প্রাণী চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। কারণ জীবিত প্রাণী চলাচল রোগ সংক্রমণে সহায়তা করে।

৪. বিভিন্ন উৎসবের এক মাস পূর্বে এলাকার খামারীদের সতর্ক করতে হবে। এ সময় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রাণী চলাচল বেড়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

৫. এলাকায় প্রাণীর প্রবেশ ও বাহির হওয়ার পথগুলিতে নজরদারি করতে হবে, যাতে কোন রোগাক্রান্ত প্রাণী এলাকায় প্রবেশ না করতে পারে। হাটবাজার থেকে ছাগল ক্রয় করে সরাসরি খামারে নেয়া যাবেনা। অন্ততঃ ২১ দিন মূল খামার থেকে দূরে পর্যবেক্ষণে (কোয়ারেন্টাইন) রাখা যেতে পারে। এরপর কৃমিনাশক ও পিপিআর রোগের ভ্যাক্সিন দিয়ে খামারের অন্যান্য ছাগলের সাথে রাখতে হবে।

৬. বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে খামারীদের গণসচেনতা সৃষ্টি করা এবং ঈদ উৎসবের পূর্বেই ভ্যাক্সিন প্রদান শুরু করা এ রোগ নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল।

৭. প্রাণী পরিবহন বাজারজাত করার সময় সনদপত্র সংরক্ষণ করার বিধান করার ব্যবস্থা শুরু করা যেতে পারে।